আলোচনা

গল্প – ঘেন্না গল্পকার – সুলেখা সান্যাল প্রকাশ – অনন্যা পত্রিকা , পঞ্চম সংখ্যা

সুলেখা সান্যালের গল্প তাঁর সময়কে ধারণ করেছে। তাদের ফোটো তোলেননি। তাদের ছবি এঁকেছেন। আর সেই ছবির ভেতরের কথাটি তুলে এনে তা প্রকাশ করতে চেয়েছেন । তার মধ্যে যেমন বেদনা আছে, সংগ্রাম আছে, তেমনি আছে ভালোবসা ও প্রতিরোধের অনিবার্য ইঙ্গিত । কোনও কারণেই তাঁকে তথাকথিত 'বামপন্থী লেখক' বলা যাবে না, যদিও তাঁর ভাবনা জুড়ে সমাজ সচেতনতা এবং বামপন্থা অবশ্যই ছিল। তবুও বলা যাবে না, কারণ কোনও রকম গোঁড়ামি বা সংকীর্ণতার ছায়াও তিনি পড়তে দেননি তাঁর লেখাতে।

সুলেখা সান্যালের করুণ জীবনকাহিনির পরতে পরতে গল্পের উপকরণ, যেমন থাকে আরো অনেক মেয়ের জীবনে। সেই গল্পগুলোতে বিক্ষিপ্ত ভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে তৎকালীন সমাজ ও সময়ের কথা, সেই সঙ্গে বিশেষ ভাবে নারীর কথা। নারীর সমস্যা, সংকট , যন্ত্রণা একাকিত্ব , আবেগ-ভালোবাসা, পিতৃতন্ত্রের পরাক্রমে তার হারিয়ে যাওয়া নিভু নিভু অবস্থান - সমস্তই তাঁর লেখাতে বিশেষ ভাবে বেজে ওঠে। অব্যক্ত অনুভূতি প্রকাশের একমাত্র মাধ্যম কিংবা অস্ত্র হয়ে ওঠে কলম।

সময়ের হাত ধরেই বিপর্যস্ত জনজীবন, দেশভাগ ও উদ্বাস্তু জীবনের যন্ত্রণা যথার্থ ছাপ ফেলেছে তাঁর ছোটগল্পে। উদ্বাস্তু বস্তির প্রেক্ষাপটে লেখা 'অন্তরায়' গল্পে বাইরের চেয়ে ভেতরের অসুখটাই বড় হয়ে ওঠে। একই পটভূমিতে এক নারীর মুক্তমনের প্রবল ঝাপটায় সংস্কার থেকে উত্তরণের গল্প 'ফল্‌গু' । উদ্বাস্তু জীবন যন্ত্রণার আধারে লেখা 'গাজন সন্ন্যাসী' গল্পে উঠে এসেছে বাঁচার জন্য যৌথ সংগ্রামের কথা। প্রসঙ্গত উল্লেখ করতে হয় আবু রুশদ্-এর লেখা 'হাড়' , সাদাৎ হাসান মান্টোর 'মেয়েটি দিল্লী থেকে এসেছিল', সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্-র 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী', হাসান আজিজুল হকের 'খাঁচা', দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'গ্রহণ', সতীনাথ ভাদুড়ীর 'গণনায়ক' প্রভৃতি আরো গল্পের কথা।

দেশভাগ ও ছিন্নমূল মানুষের ভূগোলহীন ধুকধুকে জীবনের কথাই তাঁর 'ঘেন্না' গল্পের মূল বিষয়। নারীর কলমে উঠে এসেছে নিম্নবিত্ত নারীর প্রান্তিক যাপনচিত্র। তার যন্ত্রণা, তার বিবমিষা, তার প্রতিরোধ ও আকণ্ঠ 'ঘেন্না'।

চূড়ান্ত আর্থিক সংকটে নারীর চোরাই মাল বিক্রির গোপন ইতিহাস পরিচিত। দেশভাগের ছিন্নমস্তা কালে সে ইতিহাস আরো রক্তাক্ত হয়ে ওঠে। ক্ষমতার লোলুপ জিহ্বা আরো প্রবল ভাবে লেহন করতে থাকে দারিদ্র্যকে। চোর পুলিশের খেলায় তকমার আড়ালে আত্মগোপন করে থাকে নেকড়ে-পরিচয়। শিকারীর আগ্রাসনের প্রতিরোধে একদলা থুতুর মতো উঠে আসে 'ঘেন্না'।

পূর্ববঙ্গের শিকড় ছিঁড়ে সৌদামিনী আসে এপারে। আসে খিদের দায়ে - ধর্মের সম্ভাব্য ভয়ে। ফসলের দখল নিতে গিয়ে প্রাণ যায় স্বামী কার্তিকের। পাড়ায় বাবুরাও চলে যায় দেশছেড়ে, তাই খেতে খাওয়ার উপায়টাও বন্ধ হয়ে যায়। প্রতিবেশী কানাইয়ের আকুতি ও নিষেধ অমান্য করেই ছেলের হাত ধরে হাঁটা দেয় সৌদামিনী। 'মান ইজ্জত নিয়ে টানাটানি' আর 'লোভ আর পাপের ছড়াছড়ি' আছে জেনেও অন্য দেশের পথে পা বাড়িয়েছিল সৌদামিনী। স্টেশনের হাজার প্রলোভন এড়িয়ে আশ্রয় পেয়েছিল সুন্দরীর কাছে। আরো অন্য নিম্নবিত্ত নারির মতোই অনভ্যস্ত হাতে শুরু হয় তার চরাই চালের ব্যবসা। লুকিয়ে চুরিয়ে ট্রেনে দোকানে চলতে থাকে টিকে থাকার লড়াই।

নিস্তার নেই সেখানেও। দেশহীন উদ্বাস্তু মানুষটিকে বারবার খোঁচা দেয় তারই সহযাত্রী নারীরা। সে যে পংক্তির বাইরে - এইটাই খুঁচিয়ে মনে করিয়ে দিতে চায় তারা। 'বাঙ্গাল' বলে তাকে মুহুর্মুহু হেয়

প্রতিপন্ন করেতার হীনমন্যতাটাকে লোভনীয় খাবারের মত চাটতে থাকে তারা। অর্থগত ভাবে বাতাসি, সুন্দরী, সৌদামিনী সকলেই এক শ্রেণির। কেবল শিকড়ের সামান্য ভিন্নতা। নিত্য অপমানের বাধ্যতামূলক প্রাপ্তিযোগ থেকে রেহাই পায় না সৌদামিনীর বালক পুত্রও। যন্ত্রণা দেবার হিংস্র খেলা চলে সেখানেও।

চলার পথে প্রশাসনিক কাঠামোর সকলকে তুষ্ট করে যেটুকু পয়সা ঘরে ঢোকে তা খুবই সামান্য। তবুও চলতে হয়, চালাতে হয়। এরই সাথে কিছুটা স্বস্তি ও সহানুভূতির ছোঁওয়া আসে দোকানদার সখার কথায়। সে সৌদামিনীর বিপন্নতা বোঝে, তাকে ভালোবেসে আশ্রয় দেবার কথা জানায়। বিবাহের স্বিকৃতী দিতে চায়। সোউদামিনীর ভীরু মন প্রথমে প্রথমে আস্থা না পেলেও পরে দ্বিধাদ্বন্দ্ব অতিক্রম করে সে-ও ভরসা করতে চায়। সন্তানের শিক্ষাসহ একটা ভবিষ্যতের স্বপ্ন বোনে। সেই বুননের সুতোর রন্ধ্রে রন্ধ্রেও থাকে ভয়।

গপনে চাল বিক্রি করতে গিয়ে ধরা পড়ার ভয় থাকে প্রতি মুহূর্তে। বিপদ ওঁত পেতে থাকে। তাই গোপন করার ভিন্ন পদ্ধতি ভাবতে হয়। চটের তৈরি বিচিত্র কাপড়। শরীরের ভাঁজে, পোষাকের আড়ালে থাকবে চাল। সৌদামিনী কিছুটা গররাজি হয়েই ওই পোষাক পড়ে। আর স্থির করে সেই দিনই সে ... সখাকে জানাবে তার সিদ্ধান্তের কথা।

কিন্তু গরীবের স্বপ্ন, ইচ্ছে বড্ড নড়বড়ে। বাস্তবতার পাল পায় না সহসা। ক্ষমতার প্রতাপ পুড়ে যাওয়া সিগারেটের মতোই পা দিয়ে পিষে ফেলে তাকে। খাকি পোষাক পড়া লম্বা চওড়া অফিসারের ক্ষমতা চরিতার্থ করার জন্য সঙ্গে তাঁবেদার প্রহরীও রাখে। আর ক্ষমতা যার হাতে, লালসা আর যৌনতা তো তার কাছে পুতুল খেলা। বাতাসীকে অতিক্রম করে তাদের নজর গিলতে আসে সৌদামিনীকে। সৌদামিনী প্রতিবাদ করে, চাল চুরির যদি শাস্তি হয়, তবে তা যেন সর্বসমক্ষে হয় – এমনটাই দাবি করে। কিন্তু অফিসার তো চাল চায় না। তার নরুণ-চোখ আঁতিপাতি করে খুঁজতে চায় চটের আড়ালে থাকা সৌদামিনীর শরীর। প্রশাসনিক প্রতাপ আর ভয় দেখিয়ে অধিকার করতে চায় সৌদামিনীকে। প্রথমে শিকল টেনে, পরে অফিসারের চুলের মুঠি ধরে আটকাতে চায় সৌদামিনী। প্রশাসনের পশুগুলোকে ঠেকাতে চায় নিম্নিবিত্ত প্রান্তবাসী নারী। চোখেমুখে ঘৃণা ঠিকরে ওঠে। শেষমেষ লাথির ঘায়ে চলন্ত ট্রেন থেকে ছিটকে পড়ে নগ্ন সৌদামিনী। চটের কাপড়টা হাতে থেকে যায় অফিসারের। ব্যবহারযোগ্যকে ব্যবহার করতে না পেরে তার খোলসের প্রতি ‘ঘেন্না’।

এভাবেই, পুরো গল্পে , বিশেষ করে গল্পের শেষে জীবন্ত হয়ে উঠেছে ঘৃণা। ঘৃণা রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রতি, ঘৃণা প্রশাসনিক কাঠামোর বিকৃত অঙ্গের প্রতি, ঘৃণা নিম্নবিত্ত অসহায় জীবনযাপনের প্রতি। গোটা গল্প জুড়েই এই বিবমিষার সুরটা তীব্র হয়ে বেজেছে।